ধা-রা

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

"কালের পারে যায় চলে কাল, হয়না কভু হারা
ছবির বাহন চলাফেরার ধারা
দু'বেলা সেই এ সংসারে চলতি ছবি দেখা,
এ নিয়ে রই যাওয়া আসার ইস্টেশনে একা।"

এ কথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের। কবি হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে কালের ধারা অব্যাহত — ঘটনার প্রবাহও অব্যাহত। মানুষ এই ঘটনাপ্রবাহের নীরব এবং অক্ষম দ্রষ্টা। মহাকাল যে ঘটনাকে উদ্ঘাটিত করে যাচ্ছে — সে ঘটনার ছবি মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করছে,—কিন্তু মানুষ তাকে কোনোমতেই প্রভাবান্বিত করতে পারছে না। এ সত্য যেমন পূর্বে ছিল, তেমনি এখনো আছে। মানুষের চরিত্রের এবং মানসিকতারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হোক্ না কেন এবং নতুন নতুন দর্শনের যতই উপস্থাপন ঘটুক না কেন।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন ঘটছে। প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার স্থান গ্রহণ করছে নতুন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মানুষের মানসিকতার ধারা অব্যাহতই আছে,— চিরপ্রবহমান কাল সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার বিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অথচ এই মানসিকতার বিবর্তন ঘটানোর জন্যেই ভারতবর্ষের মনীষীবৃন্দ কত চেষ্টাই না করেছেন! প্রাচীন ভারতের আর্যঋষি থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ পর্যন্ত কত কথাই না বলেছেন! কিন্তু কালের ধারা হয়তো অব্যাহতই আছে।

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে — যদিও সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোকস্নাত রাজ্যে,— অসত্য থেকে সত্যের সাম্রাজ্যে,— মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে প্রতিষ্ঠা এবং উত্তরণের প্রার্থনা করেছে, — তবুও অন্ধকার এবং অসত্যকে, মৃত্যু এবং বন্ধনকে অতিক্রম করতে পারেনি। বরং সত্যের মোড়কে অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে— আলোকে দীপ্তিতে আবৃত করে ঘনান্ধকারকেই সমাজের সিংহাসনে সমাসীন করতে চেয়েছে। এই পরিস্থিতি যেমন পূর্বে ছিল,— এখনও আছে। সমাজের বিবর্তন এই মানসিকতাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি।

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন আরো জটিল হয়েছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে নতুন নতুন তত্ত্বের অনুপ্রবেশ জীবনের ধারাকে পরিবর্তিত করেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেমন জটিল হয়েছে—তেমনি মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কও জটিল

থেকে জটিলতর হয়েছে। এই সম্পর্কগুলিকে অনুধাবন করে তার চিত্রকে পরিস্ফুট করা এবং দ্বন্দ্ব-জটিল সম্পর্কগুলিকে ফুটিয়ে তোলা যেমন সমাজবিজ্ঞানীর কাজ, তেমনি সাহিত্যিকেরও কাজ। কারণ সাহিত্যিককে তো সমাজের প্রবহমান জীবনধারার চিত্র অঙ্কন করতে হয় এবং বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যসৃষ্টির আরম্ভ ঘটালেও ঊর্ধ্ব আকাশে — তারকার সন্ধান দিতে হয়। বরং সমাজবিজ্ঞানী বিজ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্বন্দ্ব-জটিল সম্পর্কগুলির চিত্র তুলে ধরে,— তাই তার বিশ্লেষণ অত বেশি হৃদয়গ্রাহী হয় না। সাহিত্যিকের একটা স্বেচ্ছাবিতরণের সুযোগ আছে। তাঁকে যুক্তি বা তর্ক, বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হয় না। তিনি কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত করে সত্যকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন,— যাতে সাহিত্য-সত্যটি মানুষের মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে নিতে পারে। সাহিত্যিকের তাই উপস্থাপন-শৈলীটি হচ্ছে প্রধান।

উপন্যাস সাহিত্যসৃষ্টিগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ জীবন-নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয় আর যেহেতু উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করে থাকেন,— তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে সহৃদয় পাঠকের অগোচরে থাকে। তাই পাঠককেই বুঝে নিতে হয় উপন্যাস কোন সত্যটির উপস্থাপনা ঘটাচ্ছে বা কোন সত্যের দিকে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে।

উপন্যাস রচনা তাই এক দুষ্কর কর্মই। মাঝে মাঝে এমনকিছু ঔপন্যাসিককে আমরা পাই যাঁদের উপন্যাস কষ্টিপাথরের বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং কালজয়ী উপন্যাসের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে — ঔপন্যাসিকের গৌরব বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ধারা' উপন্যাসটি এমনই একটি কালজয়ী উপন্যাস। সর্বধর্মসমন্বয়ের মন্দির এর পটভূমিকা। মন্দিরে সত্যসুন্দরের উপাসনা হবে,— অসীম এবং অনন্তের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ মানুষ পাবে এবং বিশ্বআত্মার সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে ধন্য হবে, এমনটাই আশা করা যায়। কিন্তু বর্তমানকালে অধিকাংশ আশ্রমে অসত্যের সাম্রাজ্য। অসত্যের সাম্রাজ্যে সত্যের সাধনা যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি গ্লানিকরও। অথচ এই পরিবেশেও এমন কিছু লোককে থাকতে দেখি যাঁরা সত্যের অনুসন্ধানে তাঁদের রক্তাক্ত সাধনাকে চালিয়েই যান। 'ধারা' উপন্যাসের এমনিই দুটি চরিত্র 'প্রোথিত' এবং 'রুমোতি'। আকস্মিকভাবে এরা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসে। দুজনেই সর্বধর্মসমন্বয়ের আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কারোর পরিচয়ই স্পষ্ট নয়। না অন্যের কাছে—না নিজের কাছে। এই যে নিজের পরিচয় আবিষ্কার করার জন্য উভয়ের যে প্রচেষ্টা — তা উপন্যাসকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অরক্ষণীয়া মুসলমান কন্যা; আশ্রমের গুরুজি তাঁকে অতি শৈশবে স্থান দিয়েছেন এবং সমস্ত অধিকার দিয়ে তাকে আশ্রমিক সংঘে বরণ করে নিয়েছেন। এই যে মুসলমান কন্যার আশ্রমিক সংঘের অন্তর্ভুক্তি এটি সর্বধর্মসমন্বয় মন্দিরের নামটিকে সার্থক করেছে। বিহারী ভক্ত হুলবুলের চরিত্র আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। শিশু প্রোথিতকে কেন্দ্র করে তার জীবন আবর্তিত হয়েছে। ভক্তি ও

স্নেহের আতিশয্য তার মধ্যে মনুষ্যত্বের উত্তুঙ্গ মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এই চরিত্রসৃষ্টির জন্য ঔপন্যাসিক স্বতন্ত্র কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। এমনি করে 'ধারা' উপন্যাসের যতগুলি চরিত্র আছে—প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও সে সম্পর্ক কারো কাছেই প্রকাশিত নয়। ঔপন্যাসিক প্রথম থেকেই পাঠককে কৌতূহলের মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে এই সম্পর্কগুলির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসটিতে এইভাবে কৌতূহল সৃষ্টি করে রাখা এবং পরিসমাপ্তিতে বিপুল বিস্ময়বোধের উপস্থাপনা দুরূহই। আর আমাদের সাহিত্যতত্ত্বপ্রণেতারা তো বলেছেন---"অদ্ভুতরসের পরিবেশন না থাকলে সাহিত্য—সাহিত্যই হয় না।" 'ধারা' উপন্যাসটির পাঠ আরম্ভ করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পড়ে যেতেই হয়। কারণ প্রথম থেকে ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে যে কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছেন—তাকে চরিতার্থ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত যেতেই হয়। এই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের, অসত্যের সঙ্গে সত্যের যে দ্বন্দ্বজটিল সম্পর্ক, —এই সম্পর্কটির সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করে এবং আধো-আলো আধো-অন্ধকারে বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে রেখে ঔপন্যাসিক যে কৌতূহল সঞ্চারিত করেছেন, — তার জন্য তাঁর উপস্থাপন-শৈলীকে প্রশংসা করতেই হয়। অথচ ঔপন্যাসিক সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেন নি। তাই 'ধারা' উপন্যাস একটি সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার। এর মধ্যে তাঁর প্রায় কুড়িটি উপন্যাস এবং নাটক প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁকে প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকারের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বর্তমানে 'ধারা' উপন্যাসটি তাঁর আসনকে আরো প্রতিষ্ঠিত করবে। উপন্যাসটি কালজয়ী উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঔপন্যাসিককে আরো উন্নত আসনে সমাসীন করবে।

আমি 'ধারা' উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সানন্দে বরণ করি এবং বলি ঃ

"গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

[signature]

৭.১১.২০০৬

কলকাতা

হিন্দু-ইসলাম-বৌদ্ধ-খ্রিশ্চান সব কিছুর আদল নিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মন্দির। দু বেলা প্রার্থনা। ভক্তের অভাব নেই।

এ দেশে অন্নজলের অভাব থাকলেও ধর্মস্রোত আবহমান কাল থেকে প্রবহমান। চলছে। চলবেও।

মন্দিরের প্রার্থনা শেষে দুটি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

ওরা কারা?

একটি ছেলে। একটি মেয়ে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। হ্যালোজিন লাইটে মন্দির চত্বর আলোকিত। মাঝখানে ফোয়ারা। আলোর চকমকানি নিয়ে ভক্তজনদের বিমোহিত করছে। সে আলো ঠিকরে পড়ছে ওদের দুজনের মুখে। ছেলেটির বয়স অনুমানে সাতাশ। মেয়েটির বাইশ। ধরে নিলে নতুন প্রজন্মকে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

মেয়েটি ডাকল—প্রোথিত, তুমি শুনতে পাচ্ছ?

ছেলেটি উত্তর দিল—রুমোতি কান আছে শুনতে পাচ্ছি। চোখ আছে দেখতে পাচ্ছি। মন আছে। বুঝতে পারি না।

—আমরা এখানে কেন এলাম? কী পাব এখানে প্রোথিত?

—পাব না কিছুই। তুমি আগে এসেছ বলে আসতে হল। প্রফেসার সান্যালের নির্দেশ অমান্য করতে পারলাম না।

—আমার ভালো লাগছে না। তিনদিন ধরে অরক্ষণীয়া দিদিমণির সাথে এ আশ্রমের সব কিছু ঠারে ঠোরে বোঝার চেষ্টা করছি। বুঝছি না। এ যেন গোলক ধাঁধা। মনে হচ্ছে আমার মা লক্ষ্মীশ্রী গোলক ধাঁধায় ফেলে যাঁতাকলে পেষাই করার চেষ্টা করছে। পালিয়ে চল।

—আমারও ভালো লাগে না। মনে হয় অসত্যের হাটে সত্যকে বেচাকেনার পসরা সাজিয়ে বসে আছি। ধরে নাও কোনো ঝুমরি নাচের আসরে বসে আছি। বানানো পালাগান চলছে। যাকে বাবা ভাবা হচ্ছে সে বাবা নয়। যাকে মা বলা হচ্ছে সে বাবার পরিচয় উহ্য রাখছে।

রুমোতি হাসে।

—হাসছ? তোমার নাম রুমোতি। শব্দটার মানে কী?

—আমার জানার বিষয় নয়। তোমার নাম প্রোথিত। শব্দটার একটা মানে আছে বোধ হয়।

—আছেই তো; জমিতে চারাগাছ প্রোথিত না করলে সবই মরুভূমি।

—কথাটাতে তুমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে কেন?

—জানি না, এমনি বড়ো হলাম। লেখাপড়া শিখলাম। অ্যানথ্রপলজির এম.এ. হলাম। আশ্চর্য। আমার সব পাস সার্টিফিকেটে সান্‌অফ..... মানে বাবার যে নামটি আছে তাকে চিনলামই না।

—হড়ে পিঠে একই রকম। তোমাকে আগেই দুন এক্সপ্রেসে দুলতে দুলতে বলেছি। একটি ছেলের কাছে একটি মেয়ের দুলকি চালে যা বলা উচিত নয় তাও বলে ফেলেছি।

— ও সব কথা থাক। এখন ডেহেরিশন সর্বধর্ম সমন্বয়ের আশ্রম ত দেখলে। কী মনে হচ্ছে?

—তুমি বোকা। এটাই মনে হয়। নইলে তোমার মা ঋদ্ধাবতীর রূপকথার অন্দরমহলের মতো অত বড়ো মহল ছেড়ে কোন মাইক্রোস্কোপে অ্যানথ্রপলজির গবেষণা চালাবে?

—ঠিকই। বুদ্ধি আছে।

—অথচ কোলকাতার মেয়েদের কলেজের সুপার শ্রীমতী অরক্ষণীয়া দেবী বলেন একটি গবেট। কোনোরকমে বি.এ. ডিগ্রি পেলেও ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল। মা লক্ষ্মীশ্রী বলে, ঢের হয়েছে, এবার দেখেশুনে ....

—আমি কি সিলেকটেড?

—হতে পারতে। কিন্তু তোমার ওই একচোখো বন্ধু হুলবুল সিং দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে।

তীর্থক্ষেত্রে তীর্থগামী ভক্তস্রোত থেকে যেন দুজনেই গা-ঝাড়া দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে।

অদূরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মন্দির চত্বর সামনে সাজানো ফোয়ারা মাথা নত করে গুটিয়ে যায়।

ধারার প্রাক কথন

মানুষের কথা বললে কথা। গল্প হলে গল্প। সত্য হলে ভাবতে হবে মুক্তি কোথায়?

কোনো যন্ত্রণা নেই। সবই সুন্দর কেউ বলতে পারে না। সমাজের অলিখিত বিধানও তাই। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ভূমিকা থাকে।

প্রোথিত-রুমোতির যে কথোপকথন এখন চলছে সেটা একটু পরিণত বুদ্ধির মার্জিত রুচি। কিন্তু ছটফটানির রেশ শিশুকাল থেকেই মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

মা এবং বাবা কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না। অপরের ভূমিকা থাকেই না বলা চলে।

ডেহেরিশন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মন্দির প্রাঙ্গণের ঈশানকোণে একটি সুদৃশ্য বাড়ি। বাড়ি না বলে হারেম বা মহল বললেই যে কথামালা বলা হবে, মানানসই হয়।

মহলটির নাম 'প্রকৃতি বিতান'। মহলটিতে প্রবেশ করার অধিকার ছিল মাত্র তিনজনের। আর একজন নতুন জন্মের অতিথি হয়ে আসার সাথে সাথে হয়ে যায় চারজন। প্রকৃতিবিতানের মালকিন ঋদ্ধাবতী। গুরুজি গোবিন্দ অপ্রকট হলে বিরাট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক হন তাঁর পুত্র ডাঃ অঞ্জন। ভক্তিমতী শিষ্যা অর্চনার নামটি তিনিই দিয়েছিলেন ঋদ্ধাবতী। নিজে বিবাহিত হলেও ঋদ্ধাবতীর জন্য তিনি ভক্তদের অনুদান ভাণ্ডার থেকে প্রকৃতি বিতান সে সময় বানিয়ে দিয়েছিলেন। মহলের পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন গোঁফওয়ালা একচক্ষুবিশিষ্ট বিহারী ভক্ত হুলবুল সিংকে। সে চব্বিশ ঘন্টার পাহারাদার।

একবার এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিল, সিংজি একটা চোখ হারালে কী করে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর—কেয়া মালুম। গুরুজি লে লিয়া। হাম কেয়া করু।

হুলবুল সিং সত্য কথা বলেনি। প্রোথিত যখন প্রকৃতি-বিতানের মধ্যে চার পাঁচ বছরের দামাল, বলেছিল তোমার একটা চোখ নেই কেন? যেটা আছে সেটাও বেশি বক্ষ্যার প্রার্থনার পর কালোপট্টি দিয়ে ঢেকে রাখো।

সিংজি ছোট্ট শিশুকে মিথ্যে কথা বলতে পারেনি। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

ওর এক চোখে গড়িয়ে পড়া জল শিশু প্রোথিত দুহাত বাড়িয়ে মুছে দিয়ে বলেছিল— কেঁদো না, বড়ো হয়ে ডাক্তার হব। তোমার বাঁ চোখের চাওনি ফিরিয়ে দেব।

সিংজি অজানা আতঙ্ক নিয়ে বলেছিল — নেহি নেহি উয়ো নেহি হোগা। বচপন মে মধুমক্ষিকা কামড় দেনে সে উয়ো চোখ নিকাল দিয়া। ফিকরি বাত সে কাম নেহি হোগা খোঁকাবাবু। মাত বোলো। হামারা নোকরি খতম হো যায়েগা।

সব কিছু বুঝবার মতো ক্ষমতা তখন প্রোথিতের হয়নি। সে প্রকৃতিবিতানের ভিতরে এবং বাইরে হুলবুল সিংকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে করত।

রাত নামলে নরম বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে মা ঋদ্ধাবতী পরিপাটি করে সেজেগুজে কোথায় যে যেতো কিটিমিটি চোখে চেয়ে দেখলেও প্রোথিত বুঝতে পারত না। কেবলই মনে হত কোনো মৌমাছি তার চোখেও কামড় দিলে ভালো হয়।

সে ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি গেছে। যেখানেই গেছে সাথী পাহারাদার হুলবুল সিং।

হেজি পেজি ব্যাপার নয়। দেশের সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেভাবে মানুষ হয়, তাও নয়। রীতিমতো রাজকুমারের মতো প্রোথিত কোলকাতায় লেখাপড়া করেছে। একটাই বাধ্যবাধকতা, এক চোখের বন্ধু সিংজি সঙ্গছাড়া হতো না। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যেখানেই গেছে গেটের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। কখনও বসে পড়ত। দেখত দলে দলে ছেলেমেয়েরা গেট পার হয়ে আসছে, ভিতরে যাচ্ছে। কল কল খল খল বাকচাতুরি। হাসাহাসি। ঘেঁসাঘেঁসি। খেলা খেলা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রোথিতের পাহারাদার বন্ধু হয়ে মনের অন্দরে ভাবত বিহারে বাঁকা মোড় থেকে সাত মাইল দূরে রসমোতিয়া তার গাঁ। ঘর। ঘর ছাড়া দশ বছর বয়সে ডেহেরিশন গুরুজির আশ্রমে আগমন। ফাই ফরমাস খাটা। ভোজন বাজারে পেটভাতার কাজ। আশ্রমের এক পুরোহিত বলল দীক্ষা নে। চার আনা ভিক্ষা করো। চার আনা জোগাড় হল। বিশ্বমানবতার শেষ গুরুকুলে দীক্ষা হল। একাগ্রতা। নিষ্ঠা। ভক্তি। বিশ্বাস। গোপনীয়তা রক্ষা। সব ব্যাপারেই একটি প্রতিবাদহীন নিরেট পাথরের মতো বিশ্বদরবারে নিজেকে দাস বানিয়ে ফেলল। আশ্রম নিয়ামক হয়তো এরকম একটা লোক চেয়েছিলেন। হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন। কিন্তু দাসদের কি প্রাণ থাকে না? সহজাত বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা থাকে না?

এক চোখে কলেজ ইউনিভার্সিটির গেটের বাইরে হাজারো ছেলেমেয়ের আনাগোনার পথ ধরে প্রোথিতের দিকে নজর রাখতে রাখতে হুলবুল সিংয়ের কেমন যেন মাঝে মাঝে ওলটপালট হয়ে যেত। একবার সে মরদ হয়ে গাঁ ঘর রসমোতিয়া গিয়েছিল। ছোটোবেলার

ভইশ চরানো খেলার সাথী আরোতিয়াকে কথা দিয়েছিল। শাদি করবো।... শাদি হবে। সংসার হবে। বালবাচ্চা হবে।

দীর্ঘশ্বাস। কিছুই হল না। পরের ছেলের বন্ধু সেজে নোকরির খাতিরে বয়স চলে গেল। প্রোথিত বই বুকে গেটের বাইরে এলেই তাল কেটে যেত। খপ করে হাত ধরত। যেন দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিশ্বাস রাখার চরম প্রাপ্তি।

প্রোথিত হেসে বলত—তোমাকে নিয়ে পারা যায় না বন্ধু। অনেক বড়ো হয়েছি। হারিয়ে যাব?

সিংজি উত্তর দিত—কোন ক্লাস? সারা কোলকাতা বে-কেলাস। দেখছিস না হন্দ মন্দ মাইয়া লোকরা ঘোরাফেরা করছে। সিংজি ততদিনে দেহাতি টানে বাংলা বলত।

—তুমি আটকাতে পারবে?

—কে কাকে, আটকায় রে। গুরুজিই সবকিছু আটকায়। সময় হলে।

প্রাক কথন (২)

নাম কে রেখেছে রুমোতি জানে না। মা লক্ষ্মীশ্রীও কোনোদিন বলে নি।

যখন খুবই ছোটো ছিল দেখত মাঝে মাঝে একজন বাড়িতে আসতেন। বুড়োও নয়। যুবকও নয়। যাকে বলে সোনামাখা গায়ের রং..... চোখ টানত। পরনে সাদা হাফ পাঞ্জাবি। কালোপেড়ে ধুতি। সাদা চাদর। ডান হাতে পা থেকে মাথা ছোঁয়া লাঠি। লাঠির মাথায় রুপোর চাকতি!

এলেই খাতির। হাত-পা ধোয়ার জল-গামছা। শরবত। হাতপাখার বাতাস। বাড়ির মানুষদের ব্যস্ততা। রিটায়ার্ড প্রাইমারি শিক্ষক ঠাকুর্দা দীনদয়াল বলতেন ইনি সর্বধর্মসমন্বয়ের শেষগুরু গোবিন্দজির সনদধারী পুরোহিত।

রুমোতি উঠোনে ধানের গোলার ফাঁকে আড়ালে আড়ালে দেখত। ওকে দেখলেই মানুষটি হাত উস্কে কাছে ডাকত। সে যেত না। ছুটে গোয়ালঘরে লুকিয়ে যেত।

এক সিঁড়ি.... এক সিঁড়ি পার হয়ে রুমোতি বাইশ সিঁড়ি টপকাতে চললেও মনের ঘুলঘুলি দিয়ে সেই কত আগের ছবিগুলো ভুস করে ভেসে উঠলেও মীমাংসা করতে পারে না। কিংবা মা-বাবার বিছানায় ঘুম জড়ানো ভান করে থাকা অবস্থায় যে কথাগুলো শুনত, তারও সমাধান করতে পারে না।

ওই পুরোহিত কেমন মানুষ ছিলেন? তিনি বাড়ির মেয়েদের রান্না করা খাবার খেতেন না। স্বপাকে রান্না করতেন। আলু সেদ্ধ। ডাল সেদ্ধ। গাওয়া ঘি। দুটি বড়ো বড়ো ঝাল লঙ্কা। লবণ। ব্যস। খাওয়ার পর তাঁর জন্য তুলে রাখা মাদুর বালিশ পেড়ে ঘরের মেঝেয় পরিপাটি করে বিছিয়ে দেওয়া হত। তিনি খালি গায়ে বিশ্রাম নিতেন। যতক্ষণ না নাক-ডাকত-মা লক্ষ্মীশ্রী পাশে বসে বাতাস করত।

রুমোতির শিশু কৌতূহল মাথায় লুকোচুরি খেলত—এ কেমন পুরোহিত। গলায় পৈতে নেই। বাড়িতে সত্যনারায়ণ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বিশ্বকর্মা পুজো করতে যাঁরা আসেন, গলায় লম্বা পৈতে।

চলে যাবার সময় তিনি লাঠি সমেত জোড়হাতে ঠাকুর্দাকে নমস্কার জানিয়ে বলতেন গুরুজি কী কৃপা। অনেক বয়স হল, এবার গুরুজিকে মাথায় আশ্রয় দেন।

ঠাকুর্দা দীনদয়াল বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিতেন—সবই তাঁর কৃপা। সময় হলেই হবে। আমাদের তো কুলগুরু আছেন।

—জগৎগুরু ধরলেই ভালো হয়। নাতনির নাম কেমন হয়েছে?

—খুব ভালো।

মনভোলানো হাসি নিয়ে ঠকঠকিয়ে চলে যেতেন। মা লক্ষ্মীশ্রী যাবার পথে গড় হয়ে প্রণাম করত। বলত, বাপিজি, আবার আপনি আসবেন।

—আসতে ত ভালোই লাগে।

ওইটুকুই।

...... এসব রুমোতির বয়সের সিঁড়ির চার নম্বর পাঁচ নম্বর ধাপে ওঠার ছবি। গুরুগম্ভীর কথা। ভালোভাবে বুঝত না। ছয় সাতে উঠে মাটির দিকে নজর পড়লো। মানুষের ভালোমন্দ আঁকিজুকি দাগের দিকে মন বসাল।

মা লক্ষ্মীশ্রী বাবা পৃথ্বীলেশকে দেখিয়ে একদিন বলেছিল, বাবা বলিস কেন। ছেলে বলে ডাকলে আমার ভালো লাগে।

সে কথা শুনে রান্নাঘর থেকে ঠাকুমার সে কী রাগ। লেখাপড়া-জানা মেয়ে হাইস্কুলের মাস্টারনি। কথার কোনো ছিরি নাই গা। বাপকে ডাকতে শেখাচ্ছ ছেলে বলে।

প্রতিবাদী মায়ের উচ্চগ্রামে উত্তর—তফাত কী? বাপকে ছেলে বললে মেয়ের কাছে বাপের আদর বেড়েই যায়।

—ঢং কর না..... ঢং কর না। সাতজন্মেও এমন কথা শুনিনি।

—আগের জন্মের কথা মনে আছে আপনার। সাত জন্মের কথা বলছেন? জন্ম পাল্টাচ্ছে। মানুষও পাল্টাচ্ছে। পরিচয় একটু এদিক-ওদিক হলে ক্ষতি কী? বাপ তো বাপই থাকবে।

অবুঝ অশিক্ষিত শাশুড়ির চিল চিৎকার। স্বামীর উদ্দেশে। বলি শুনছ, লাটাই ঘুরিয়ে শনের দড়ি বানাচ্ছ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে? তখনই বলেছিলাম শিক্ষিত বউ, চাকুরে বউ ঘরে এনো না। আমার সবেধন একটি পৃথ্বীর হাড়ে দুব্বো গজাবে এ বউ। বলি ও পৃথ্বি তুই ত ঘরে আছিস। কানে কালা নাকি। শুনতে পাচ্ছিস না। তুই একটা আস্ত ভ্যাড়া। ও মেয়ে তোর মেয়ে নয়।

তখন বুঝতে পারেনি। কচি ঠোঁটে হাসি পেয়েছিল। এখন বাইশে এসে ভাবায়।

মানুষের গোপন বাসনায় যত সিঁদকাঠি ঘোরে কত পাক ঘুরল প্রকাশ্যে কেউ বলতে পারে কি? মা বাবা যেই হোক না কেন কেউ বলে না। অথচ তাদের অব্যক্ত লীলা শিশুমনে কাজ করে। তারও গোপনীয়তা রক্ষা হয়। রূপকথার দৈত্যের ভয়ে।

এক নিরিবিলি আঁধারে বিছানায় রুমোতিকে মাঝে নিয়ে মা লক্ষ্মীশ্রী বলছে ফিসফিসিয়ে—বাড়িসুদ্ধ সবাই বলছে রুমি নাকি তোমাদের বংশের কারও মতো দেখতে হয়নি। এমনকি আমার মতো ছ্যাঁপা নাক নয়। কালো রং নয়। টকটকে গৌরবর্ণ রং। টানা টানা চোখ। উঁচু নাক। পাতলা ঠোঁট। মিষ্টি মধুর হাসি। তোমাদের মন্ডল ঘরে যারা জন্মায়